Shailajananda Mukhopadhyayer 'Koylakuthi' Golpe Adivasi Samajjiboner Rupayan: Ek Samaj-Sanskritik Bishleshan

Dwijendra Nath Murmu

Research Scholar, Department Of Bengali, Sidho Kanho Birsha University

সারসংক্ষেপ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে কয়লাখনি অঞ্চল, খনি-শ্রমিক, সাঁওতাল ও অন্যান্য প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে পথিকৃত। তাঁর 'কয়লাকুঠি' গল্পটি কার্তিক ১৩২৯-এ *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এই গল্পের মধ্য দিয়েই তিনি স্বতন্ত্র গল্পকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সমালোচনায় এই রচনাকে বাংলা সাহিত্যে খনি-অঞ্চলভিত্তিক বাস্তবধর্মী আঞ্চলিক রচনার এক প্রাথমিক ও তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়েছে। গল্পটিতে কয়লাখনি-নির্ভর অর্থনীতি, শ্রমশোষণ, দারিদ্র্য, আদিবাসী সমাজের জীবনযাপন, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং প্রান্তিকতার বোধ একসঙ্গে ধরা পড়েছে। এই প্রবন্ধে পাঠ-নির্ভর গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, 'কয়লাকুঠি' কেবল খনি-জীবনের দলিল নয়; এটি আদিবাসী সমাজের সামাজিক অবস্থান, শ্রম-অভিশাপ, মানবিক টানাপোড়েন ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বেরও এক গভীর শিল্পরূপ। শৈলজানন্দ এখানে আদিবাসী মানুষকে 'লোক-রোমাঞ্চ'-এর বিষয় হিসেবে নয়, বরং জীবন্ত সামাজিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

মূল শব্দ: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কয়লাকুঠি, আদিবাসী সমাজ, সাঁওতাল, খনি-শ্রমিক, আঞ্চলিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন গ্রামীণ বা ভদ্রসমাজ-নির্ভর জীবনচিত্র প্রধান থাকলেও খনি-অঞ্চলের অন্ত্যজ, শ্রমজীবী, সাঁওতাল ও বাউড়ি মানুষের জীবন তেমন গুরুত্ব পায়নি। এই অনুল্লিখিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে প্রথম দৃশ্যমান করে তোলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, তিনি খনিশ্রমিক, সাঁওতাল এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করেন এবং এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস সম্পর্কিত নিবন্ধেও তাঁকে খনি-শ্রমিককে কেন্দ্র করে গল্পরচনার পথিকৃৎ ও আঞ্চলিকতার প্রয়োগকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'কয়লাকুঠি' গল্পটি শৈলজানন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে জন্ম নিয়েছিল। কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াত, কুলি-মজুর সরবরাহের কাজ এবং সাঁওতাল পরগনায় ঘোরাফেরার অভিজ্ঞতা তাঁকে এই সমাজকে ভিতর থেকে দেখার সুযোগ দেয়। সেই কারণেই গল্পটি কল্পিত লোকরঞ্জন নয়; বরং শ্রম, শোষণ, প্রান্তিকতা ও মানবিক বেঁচে থাকার লড়াইয়ের বাস্তবতায় নিবদ্ধ। খনিজীবন নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনাতেও 'কয়লাকুঠি'কে ১৯২২ সালের এক প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ খনি-ভিত্তিক রচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হল 'কয়লাকুঠি' গল্পে আদিবাসী সমাজজীবনের রূপায়ণকে সমাজ-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। এখানে বিশেষভাবে দেখা হবে—গল্পে আদিবাসী মানুষ কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, শ্রম ও শোষণের কাঠামো কীভাবে

কাজ করছে, নারীচরিত্র কীভাবে দ্বৈত প্রান্তিকতার ভার বহন করছে, এবং ভাষা-রীতি ও পরিবেশ-চিত্রণের মাধ্যমে খনি-অঞ্চল কীভাবে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ভূগোল হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

শৈলজানন্দ সম্পর্কে বাংলাপিডিয়া জানায় যে, কয়লাকুঠিতে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি খনিশ্রমিক-সাঁওতাল জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর রচনার সামাজিক ভিত্তি কেবল সহানুভূতি নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

বাংলা ছোটগল্পের সামগ্রিক পর্যালোচনায়ও শৈলজানন্দকে খনি-শ্রমিকদের নিয়ে গল্পরচনার পথিকৃৎ বলা হয়েছে এবং বাংলা ছোটগল্পে আঞ্চলিকতার প্রথম সফল প্রয়োগকারীদের একজন হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই মূল্যায়ন ‘কয়লাকুঠি’ গল্পকে কেবল একটি বিষয়ভিত্তিক গল্প না ভেবে বাংলা কথাসাহিত্যের রূপান্তরমূলক মুহূর্ত হিসেবে পড়তে সাহায্য করে।

বিশ্বভারতী-সংশ্লিষ্ট একটি গবেষণাপত্রে জাতীয়করণ-পূর্ব খনিজীবনের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ‘মাসিক বসুমতী’-তে ১৯২২ সালে প্রকাশিত ‘কয়লাকুঠি’ নামক ছোটগল্পের মাধ্যমেই শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন এবং রানিগঞ্জ-আসানসোলের খনি-অঞ্চলকে সাহিত্যিক পরিসরে নিয়ে আসেন। একই আলোচনায় খনি-অঞ্চলকে নানা ভাষা, জাতি ও শ্রমসম্পর্কের সংমিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ সামাজিক অঞ্চলেরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আঞ্চলিকতা বিষয়ক একটি বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণায় শৈলজানন্দের ‘কয়লাকুঠি’ সিরিজকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে গল্পটির কেন্দ্রে সাঁওতাল নারীচরিত্র আছে এবং এই ধারার মধ্যে আদিবাসী জীবন, স্থানীয় ভাষা ও পরিবেশ বিশেষ শিল্পরূপ পেয়েছে। ফলে সমালোচনামূলক পাঠে ‘কয়লাকুঠি’কে আদিবাসী সমাজজীবনের অভ্যন্তরীণ ও সাংস্কৃতিক পাঠ হিসেবেও দেখা সম্ভব।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—
১. ‘কয়লাকুঠি’ গল্পে আদিবাসী সমাজজীবনের রূপায়ণের প্রকৃতি নির্ণয় করা।
২. গল্পে খনি-অঞ্চলের শ্রম, শোষণ ও প্রান্তিকতার কাঠামো বিশ্লেষণ করা।
৩. আদিবাসী নারীচরিত্রের উপস্থাপনা ও তার সমাজ-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিচার করা।
৪. ভাষা, পরিবেশ ও আঞ্চলিকতার ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পের শিল্পগঠন অনুধাবন করা।
৫. বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বে ‘কয়লাকুঠি’-র গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।

মূল বিষয়বস্তু আলোচনা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠি’ গল্পে কয়লাখনি অঞ্চল কোনো নির্জীব বা বাহ্যিক পটভূমি নয়; বরং এটি একটি সক্রিয়, জটিল এবং বহুমাত্রিক সামাজিক ভূগোল। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভূগোলের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর, কারণ এখানে প্রকৃতি, শ্রম, অর্থনীতি, ক্ষমতা, শোষণ এবং মানবিক সম্পর্ক পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিশেষ জীবনবাস্তবতা নির্মাণ করেছে। রানিগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই অঞ্চল একদিকে আধুনিক শিল্পসভ্যতার প্রতীক, অন্যদিকে সেই শিল্পায়নের অন্ধকার মূল্যও বহন করে। খনি এখানে কেবল কয়লা উত্তোলনের স্থান নয়; এটি একটি

সামাজিক বিন্যাস, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির মানুষের সংঘাতময় সহাবস্থান তৈরি হয়েছে।

গল্পে দেখা যায়, এই অঞ্চলে মালিক, ম্যানেজার, বাবু, দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী, সর্দার, কুলি, কামিন, সাঁওতাল, বাউড়ি প্রভৃতি নানা গোষ্ঠী একই অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের অবস্থান মোটেই সমান নয়। ক্ষমতা ও উৎপাদনের কেন্দ্রে যারা আছে, তারা দৃশ্যত কম পরিশ্রম করে বেশি লাভ ভোগ করে; আর যারা শ্রমের মূল বাহক, তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় অর্থেই সবচেয়ে অনিরাপদ। এই বৈপরীত্যই খনি-অঞ্চলকে কেবল কর্মক্ষেত্র না রেখে একটি শক্তিশালী সমাজতাত্ত্বিক পরিসরে উন্নীত করেছে। শৈলজানন্দের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই অসম সম্পর্কের জগৎকে অত্যন্ত স্বাভাবিক, অভিজ্ঞতালব্ধ এবং বাস্তবধর্মী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

কয়লাখনির পরিবেশও এখানে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কালো কয়লার ধুলো, অন্ধকার খাদ, যন্ত্রের গর্জন, শ্রমিকবস্তির ঘিঞ্জি বাসস্থান, ক্লান্ত-অবসন্ন শরীর, অনাহারী সংসার—সব মিলিয়ে গল্পে খনি-জীবনের একটি ঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিবেশ শুধু দৃশ্যমান নয়; এটি চরিত্রদের মানসিকতা, আচরণ, সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে কয়লাখনি অঞ্চলটি কাহিনির একটি নীরব পটভূমি না থেকে নিজেই এক প্রভাবশালী চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শৈলজানন্দ এই খনি-জীবনের ভিতরকার স্পন্দনকে ধারণ করতে পেরেছেন বলেই তাঁর গল্পে অঞ্চলটি মানচিত্রের একটি অংশ না হয়ে সামাজিক ভাগ্যের এক সংকেত হয়ে ওঠে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, গল্পের খনি-অঞ্চল তথাকথিত 'সভ্যতার প্রান্ত' নয়, বরং মূলধারার শিল্প অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য এক কেন্দ্র। কিন্তু এই কেন্দ্রের ভিতরে যারা বাস করে, তারা সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক স্বীকৃতির বিচারে প্রান্তিক। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থানই কয়লাখনি অঞ্চলের গভীর ট্র্যাজেডি। শৈলজানন্দ এই ট্র্যাজেডিকে কাব্যিক আবেগ দিয়ে ঢেকে দেননি; বরং বাস্তবতার নির্মমতাকে শিল্পে রূপ দিয়েছেন। সেই কারণে 'কয়লাকুঠি'তে খনি-অঞ্চল একটি সামাজিক ভূগোল হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আধুনিকতার অন্তঃসারশূন্যতারও একটি সমালোচনামূলক প্রতীক।

'কয়লাকুঠি' গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আদিবাসী মানুষকে কোনো রোমান্টিক, দূরবর্তী বা রহস্যময় জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়নি। বরং তারা এই সমাজ ও অর্থনীতির অত্যন্ত বাস্তব, কার্যকর এবং অপরিহার্য অংশ হিসেবে উপস্থিত। বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশে আদিবাসী জীবন বহুদিন ধরে লোকজ সৌন্দর্য, প্রকৃতিনির্ভর সরলতা অথবা 'অসভ্য' অন্যতার এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। শৈলজানন্দ সেই চর্চা থেকে বেরিয়ে এসে আদিবাসী মানুষকে শ্রমজীবী, দুঃখভাগী, প্রেমময়, সংগ্রামী এবং মানবিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

গল্পে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী চরিত্রদের অবস্থান খনিশিল্পের মেরুদণ্ডের মতো। তাদের শ্রম ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়, অথচ সেই শ্রমের বিনিময়ে তারা যে সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক স্বস্তি বা মানবিক সম্মান পাওয়ার কথা, তা তারা পায় না। তাদের নাম প্রায়শই মুছে যায় বৃহত্তর শ্রমসমাজের মধ্যে; কিন্তু তাদের পরিশ্রম কখনো অদৃশ্য হয় না। এখানেই গল্পের সমাজতাত্ত্বিক গভীরতা। শৈলজানন্দ দেখিয়েছেন, আধুনিক শিল্পসভ্যতা যাদের শ্রমের ওপর দাঁড়ায়, সেই মানুষদেরই সে সবচেয়ে বেশি অবমূল্যায়ন করে।

তবে এই উপস্থাপনা নিছক সহানুভূতিনির্ভর নয়। আদিবাসী চরিত্ররা এখানে করুণার পাত্র হয়ে ওঠেনি। তাদের জীবনে প্রেম আছে, দৈহিক টান আছে, উৎসব আছে, গোষ্ঠীগত স্মৃতি আছে, পারস্পরিক নির্ভরতা আছে; আবার আছে ক্লান্তি, ক্ষুধা, প্রতারণা, অনিরাপত্তা ও বঞ্চনা। এই বহুমাত্রিক উপস্থাপনা তাদেরকে 'সামাজিক টাইপ' থেকে মুক্ত করে 'পূর্ণ মানুষ'-এ

পরিণত করেছে। শৈলজানন্দ তাঁদের জীবনকে উপরতলার দৃষ্টিতে দেখেননি; বরং তাদের অভিজ্ঞতার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন।

গল্পে আদিবাসী সমাজের দুঃখই শুধু নেই; তাদের অস্তিত্বের ভিতরকার মর্যাদাবোধও আছে। তারা কেবল শোষিত নয়, তারা বেঁচে থাকা মানুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে সাহিত্যিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও একধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈলজানন্দ যেন বলতে চেয়েছেন, সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষও কাহিনির কেন্দ্র হতে পারে, এবং তাদের জীবনও শিল্পসাহিত্যের উপযুক্ত বিষয়। আদিবাসী মানুষকে 'লোকজ' বা 'বিচিত্র' রূপে না দেখিয়ে, শ্রমনির্ভর বাস্তব জীবনসত্তা হিসেবে তুলে ধরাই 'কয়লাকুঠি'-র বিশেষ শক্তি।

'কয়লাকুঠি' গল্পের কেন্দ্রীয় সুরগুলির মধ্যে অন্যতম হল শ্রম ও শোষণের জটিল সম্পর্ক। খনি-অঞ্চলে শ্রমই জীবিকার একমাত্র ভরসা, কিন্তু সেই শ্রমই শ্রমিকের জীবনকে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন করে তোলে। কয়লা উত্তোলনের কঠোর শারীরিক পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা, অনিশ্চিত মজুরি, ঋণ, দালালি, এবং ক্ষমতাহীনতার সম্মিলিত চাপে শ্রমিকজীবন এক দীর্ঘ দুর্ভোগে পরিণত হয়। শৈলজানন্দ এই শ্রমজীবনের বেদনাকে আবেগঘন ভাষায় নয়, খুব স্বাভাবিক অথচ তীক্ষ্ণ বাস্তবতার ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন।

এই শোষণ দ্বিমাত্রিক। প্রথমত, এটি অর্থনৈতিক। শ্রমিকের শরীর খনির মূল সম্পদ, অথচ সেই শরীরের ওপর তার নিজের মালিকানা নেই বললেই চলে। সে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে, কিন্তু তার জীবনের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা বা ভবিষ্যৎ সে কিনতে পারে না। অর্থাৎ তার শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয় বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী, মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী নয়। দ্বিতীয়ত, এই শোষণ সামাজিক। আদিবাসী পরিচয়, দরিদ্রতা, অশিক্ষা, শ্রেণিগত নিচুত্ব এবং সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা—সব একসঙ্গে তাকে দুর্বল করে। ফলে সে কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শিকার নয়; একটি সামগ্রিক সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর অধীনেও আবদ্ধ।

গল্পে এই শোষণকে কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব হিসেবে নয়, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা যায়। শ্রমিকের ক্লান্ত শরীর, অনিশ্চিত উপার্জন, দুর্ঘটনাপ্রবণ কাজ, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, নিত্যঅভাব, নারীর অরক্ষিত অবস্থা—সবই শোষণকে দৃশ্যমান করে। শৈলজানন্দ দেখিয়েছেন, শিল্পায়ন কেবল উন্নতির গল্প নয়; এটি মানুষের শরীর ও অস্তিত্বকে পণ্য করে তোলার ইতিহাসও। কয়লাখনি সেই ইতিহাসের এক রূঢ় উদাহরণ।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খনি-শিল্পের বাহ্যিক আধুনিকতা সত্ত্বেও এর অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক। ক্ষমতা ওপর থেকে নিচে নেমে আসে; জবাবদিহিতা নেই; শ্রমিকের কণ্ঠস্বর প্রায় নিঃশব্দ। অর্থাৎ শিল্পায়ন সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং পুরনো বৈষম্যকে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করেছে। আদিবাসী শ্রমিক এই দুই বলয়ের মাঝখানে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কারণেই 'কয়লাকুঠি'কে শুধু খনি-জীবনের গল্প বলা যথেষ্ট নয়; এটি আধুনিক শিল্পসভ্যতার নৈতিক ব্যর্থতারও দলিল।

'কয়লাকুঠি' গল্পে আদিবাসী নারীচরিত্রের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, শৈলজানন্দ কেবল খনি-শ্রমিক পুরুষদের কঠোর জীবনচিত্রই আঁকেননি; তিনি নারীর অবস্থানকেও সেই একই সামাজিক পরিসরের মধ্যে বিচার করেছেন। এর ফলে গল্পটি এক নতুন মাত্রা পায়। আদিবাসী নারী এখানে শুধু ভালোবাসার অবলম্বন, সৌন্দর্যের প্রতীক বা করুণার বিষয় নয়; সে শ্রমজীবী, অনুভবশীল এবং পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক পূর্ণ মানুষ।

তবে তার জীবন পুরুষের তুলনায় আরও বেশি সংকটময়। একদিকে সে দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী; অন্যদিকে সে নারী। এই দুই পরিচয়ের কারণে তার ওপর শোষণ ও অনিরাপত্তার মাত্রা দ্বিগুণ হয়। খনি-অঞ্চলের শ্রমসংস্কৃতিতে নারীর শরীর শ্রমের মাধ্যমও, আবার পুরুষতান্ত্রিক লোভ ও সহিংসতার লক্ষ্যও। ফলে তার জীবনযাপন সবসময় একধরনের সামাজিক বিপদের মধ্যে আবদ্ধ। সংসারের অভাব, শ্রমের চাপ, যৌন-অসুরক্ষা, সামাজিক মর্যাদাহীনতা এবং আবেগগত নিঃসঙ্গতা—সব মিলিয়ে আদিবাসী নারীচরিত্রের মধ্যে একটি জটিল বেদনাবোধ তৈরি হয়।

শৈলজানন্দের সংবেদনশীলতা এখানেই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তিনি নারীকে নিছক নিষ্পাপ বা একমাত্র ভুক্তভোগী হিসেবে দেখান না। তিনি তাকে জীবনসংগ্রামী মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তার ইচ্ছা আছে, তার আকর্ষণ আছে, তার ক্লান্তি আছে, তার বেঁচে থাকার নিজস্ব কৌশল আছে। এই মানবিকীকরণ সাহিত্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে নারীচরিত্র প্রতীকে সীমাবদ্ধ থাকে না; বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা পায়।

আদিবাসী নারীচরিত্রের এই উপস্থাপনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে খনি-সমাজে নারীর প্রশ্ন কেবল লিঙ্গের প্রশ্ন নয়; এটি শ্রেণি, জাতিগত প্রান্তিকতা এবং শ্রম-শোষণের প্রশ্নের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। ফলে 'কয়লাকুঠি' গল্পে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বৃহত্তর সমাজ-সাংস্কৃতিক বাস্তবতারই একটি অন্তর্নিহিত রূপ উন্মোচিত হয়। শৈলজানন্দের মানবিক দৃষ্টি এই দ্বিগুণ প্রান্তিকতাকে সনাক্ত করেছে বলেই তাঁর গল্প আজও সমকালীন পাঠে নতুন তাৎপর্য বহন করে।

'কয়লাকুঠি' গল্পের সাহিত্যিক সার্থকতার একটি বড় দিক হল এর ভাষা, ভঙ্গি, পরিবেশচিত্র এবং আঞ্চলিক উপাদানের সংগঠিত ব্যবহার। শৈলজানন্দ আঞ্চলিকতাকে বাহ্যিক রঙিন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং ভাষা ও জীবনরীতির মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণ করেছেন। এই কারণে গল্পটি পড়লে মনে হয়, আমরা শুধু ঘটনা পড়ছি না; একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ, তাদের কথা বলার ধরন, তাদের অভ্যস্ত জীবনছন্দ, তাদের সামাজিক বোধ—সব মিলিয়ে এক সম্পূর্ণ জগৎ প্রত্যক্ষ করছি।

ভাষা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় শব্দ, উচ্চারণ, সংলাপের স্বাভাবিকতা এবং কথ্যতার মধ্যে দিয়ে শৈলজানন্দ চরিত্রদের সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই ভাষা গল্পকে কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করেছে। পাঠক অনুভব করতে পারে যে এই চরিত্ররা বইয়ের পাতায় তৈরি নয়; তারা বাস্তব জীবনের মানুষ। বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার যে শিল্পরূপ পরবর্তী কালে আরও বিস্তৃত হয়, 'কয়লাকুঠি' সেই প্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উদাহরণ।

সংস্কৃতিগত দিক থেকেও গল্পটি সমৃদ্ধ। আদিবাসী সমাজের সমবায়ী জীবনভাব, পারস্পরিক নির্ভরতা, শ্রমের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, লোকধর্মী মনোভঙ্গি, উৎসব বা গোষ্ঠীস্মৃতির অন্তর্লীন ছাপ—সবই গল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত। শৈলজানন্দ এই সংস্কৃতিকে কখনো অবমূল্যায়ন করেন না। বরং খনি-অর্থনীতির নির্মমতার মুখে এই সংস্কৃতির মানবিক শক্তি আরও স্পষ্ট হয়। এখানেই গল্পটির সমাজ-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। আদিবাসী সংস্কৃতি এখানে শুধু অতীতের স্মারক নয়; এটি জীবন্ত, চাপের মুখে থাকা, কিন্তু এখনও টিকে থাকা এক সাংস্কৃতিক শক্তি।

আঞ্চলিকতার এই প্রয়োগের ফলে গল্পটি দ্বিগুণ লাভবান হয়েছে। একদিকে তা বাস্তবতা অর্জন করেছে, অন্যদিকে সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসেবেও গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ ভাষা ও পরিবেশের সত্যতা ছাড়া প্রান্তিক মানুষের জীবনকে শিল্পে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায় না। শৈলজানন্দ এই বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণে সফল হয়েছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠি’ গল্পের গভীরে যে মানবতাবাদ কাজ করে, তা আবেগপ্রবণ সহানুভূতির মানবতাবাদ নয়; বরং সামাজিক সত্য-নির্ভর, বাস্তবতাসচেতন মানবতাবাদ। তিনি প্রান্তিক মানুষের কষ্ট দেখিয়েছেন, কিন্তু তাদের কেবল করুণার বিষয় করে তোলেননি। তিনি তাদের শ্রম, প্রেম, দেহ, সংস্কৃতি, দুঃখ, অপমান এবং মর্যাদাবোধ—সবকিছুকেই শিল্পের উপযুক্ত বলে স্বীকার করেছেন। এই স্বীকৃতিই প্রান্তিক মানুষকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেয়।

বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় দীর্ঘদিন ভদ্রসমাজের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই পরিসরে কয়লাখনির সাঁওতাল, কুলি, কামিন, বাউড়ি বা নামহীন শ্রমিকদের জীবন অদৃশ্য ছিল। শৈলজানন্দ এই অদৃশ্য মানুষদের দৃশ্যমান করেছেন। সাহিত্যিকভাবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, কারণ সাহিত্যে যার প্রতিনিধিত্ব নেই, সমাজেও তার কণ্ঠস্বর প্রায়শই দুর্বল থাকে। ‘কয়লাকুঠি’ সেই নীরব মানুষের জীবনকে ভাষা দিয়েছে।

এই মানবতাবাদ কোনো উচ্চকিত নৈতিক বাণী নয়। বরং তা গল্পের গঠন, চরিত্রচিত্রণ, পরিবেশচিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত। লেখক প্রান্তিক মানুষকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করেন না; তাদের জীবনাভিজ্ঞতার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি গল্পটিকে শুধু সামাজিক দলিল নয়, গভীর মানবিক শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। পাঠক চরিত্রদের জন্য কাঁদে না শুধু; তাদের জীবনের ভেতরে থাকা অসমতা, বঞ্চনা এবং মর্যাদার প্রশ্ন সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য হয়।

এই কারণেই ‘কয়লাকুঠি’ আজও প্রাসঙ্গিক। সমাজ বদলেছে, শিল্পের রূপ বদলেছে, শ্রমের প্রযুক্তি বদলেছে; কিন্তু প্রান্তিক মানুষের প্রশ্ন, শ্রমের মূল্য, মর্যাদার অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। শৈলজানন্দের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাহিত্য কেবল সৌন্দর্যের স্থান নয়; এটি সমাজের অদৃশ্য মানুষদের দৃশ্যমান করে তোলারও একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সেই অর্থে ‘কয়লাকুঠি’ প্রান্তিক মানুষের সাহিত্যিক ইতিহাসে এক স্থায়ী স্থান অধিকার করে আছে।

উপসংহার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠি’ গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়বদলের নিদর্শন। এই গল্পে কয়লাখনি অঞ্চল প্রথমবারের মতো শুধু শিল্পাঞ্চল হিসেবে নয়, একটি বহুমাত্রিক সমাজ-সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আদিবাসী মানুষ এখানে লোকচিত্রের অংশ নয়; তারা ইতিহাস, শ্রম, বেদনা, প্রেম, বঞ্চনা ও অস্তিত্বসংগ্রামের বাস্তব মানবসমাজ। গল্পে খনি-অর্থনীতির কঠোরতা যেমন আছে, তেমনি আছে আদিবাসী সমাজের স্বাতন্ত্র্য, মানবিকতা ও সাংস্কৃতিক স্থিতি। সাঁওতাল ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষের জীবনকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়ার মধ্য দিয়ে শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন বাস্তববাদী ও আঞ্চলিক দৃষ্টির সূচনা করেন। তাই ‘কয়লাকুঠি’ শুধু আদিবাসী সমাজজীবনের রূপায়ণ নয়; এটি প্রান্তিক ভারতবর্ষের এক প্রাথমিক সাহিত্য-ইতিহাসও।

তথ্যসূত্র

- চক্রবর্তী, অংশুমান। (২০২৫, ৫ জানুয়ারি)। *কয়লাকুঠির লেখক। জাগো বাংলা।*
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)। (২০১৪, ৪ মে)। *ছোটগল্প। বাংলাপিডিয়া।* এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)। (২০১৫, ৪ মার্চ)। *মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। বাংলাপিডিয়া।* এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

- মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। (১৩২৯, কার্তিক)। *কয়লাকুঠি মাসিক বসুমতী*। গল্পটির প্রথম প্রকাশ-সময় কার্তিক ১৩২৯ বলে পরবর্তী নির্ভরযোগ্য আলোচনায় উল্লেখ আছে।

- পাত্র, ঝুমা। (২০২৪, ২৪ জানুয়ারি)। *বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জাতীয়করণ পূর্ববর্তী খনিজীবন। প্রান্তিক গবেষণা পত্রিকা,* ২(২), ৮৪–৮৯।